অনেক ভারতীয় মনে করেন দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে দেশভাগজনিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। অথচ পাকিস্তানে অনেক মুসলমানের কাছে, বিশেষ করে মতাদর্শীদের কাছে দেশভাগের অর্থই ছিল স্বাধীনতা। কাজেই দক্ষিণ এশিয় ইতিহাসচর্চায় 'দেশভাগ' বা 'পার্টিশান' যে সবচাইতে বিতর্কিত আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এই বিষয়ে যে পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে তা রীতিমত আশ্চর্যজনক।[১৭২] সেই বিশাল ইতিহাসচর্চার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করার মত পরিসর আমাদের নেই। তবে কয়েকটি প্রধান ধারার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ইতিহাস চর্চায় শুরুতেই উচ্চকোটির ওপরে নজর দেওয়া হয়, অর্থাৎ এই মহাকাব্যিক নাটকের প্রধান চরিত্র হলেন দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা। কোন কোন পাকিস্তানি ঐতিহাসিকের কাছে পার্টিশনের সর্বপ্রাথমিক অর্থ হল মুক্তির অভিজ্ঞতা; দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অমোঘ পরিণতি, যে প্রক্রিয়া সৈয়দ আহ্‌মেদ খান ও অন্যান্য ব্যক্তিরা শুরু করেছিলেন যখন দক্ষিণ এশিয় মুসলমানেরা তাদের জাতীয় সত্তাকে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করে। ১৯৪০-এর দশকে উপমহাদেশের জটিল রাজনীতির মধ্যে এই সত্তাই সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে।[১৭৩] আইৎজাজ আহসানের কাছে পার্টিশন ছিল "আদিকালীন বিভাজন" —

Scanned by CamScanner

"যে বিভাজন ৫০ বর্ষীয় তরুণ এবং ৫০০০ বর্ষীয় বৃদ্ধ"।[১৭৪] আকবর আহ্‌মেদ মনে করেন "মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তানের ধারণাটি ছিল অপ্রতিরোধ্য ও বহুল পরিব্যাপ্ত"। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তারা "দেশভাগ ছিনিয়ে নেয়" এবং এইভাবে তারা তাদের নিজস্ব পৃথক ইতিহাস দাবি করে।[১৭৫] এই ইতিহাসের প্রধান স্থপতি ছিলেন জিন্না ও মুসলিম লীগের নেতারা। এই ঘরানার বিরুদ্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে যেখানে দেশভাগের অনিবার্যতা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। উমা কাউরা (১৯৭৭), স্ট্যানলি ওলপার্ট (১৯৮৪), অনিতা ইন্দর সিংহ (১৯৮৭), আর.জে. মুর (১৯৮৮), ইয়ান ট্যাবলট (১৯৮৮), মুশিরুল হাসান (১৯৯৩,১৯৯৭) এবং আরও সাম্প্রতিক কালে সুচেতা মহাজন (২০০০)—গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম তারতম্য ও অর্থগত পার্থক্য সত্ত্বেও, সকলেই তাঁদের গবেষণার মধ্যে বারে বারেই উল্লেখ করেছেন যে কংগ্রেসের নেতারা ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ ভারতের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যদিকে জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগ, যাঁরা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' কথা বলেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের দুঃখজনক যে-ব্যবচ্ছেদ এড়ান সম্ভব ছিল, তার জন্য দায়ী ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পরে জিন্না কংগ্রেস থেকে দূরে সরে আসেন। ব্রিটেনের দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা অবধি পাকিস্তান দাবির সংজ্ঞা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে যদি জিন্না খানিকটা নরম হয়েও থাকেন, তবে "সর্বদাই এটি সম্ভবপর" বলে তিনি মনে করেতন।[১৭৬] অন্যভাবে বলা যেতে পারে এই ব্যাখ্যা দুটি মৌলিক ধারণার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে—অসীম রায় যাকে বলেছেন "পার্টিশান সংক্রান্ত দুটি কল্পকাহিনী"। অর্থাৎ "পার্টিশানের পক্ষে লীগ" এবং "ঐক্যের পক্ষে কংগ্রেস"।[১৭৭] সম্প্রতি 'সংশোধনবাদী' ইতিহাসচর্চায় পার্টিশান সংক্রান্ত পরিচিত বৃত্তান্তের এই দুই সেকেলে বাঁধা-বক্তব্যকে সজোরে আক্রমণ করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান যখন সৃষ্ট হয়, তখন সেদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ষাট মিলিয়ন, অমুসলিম ভারতে থেকে যায় আরও পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন মুসলমান। এই প্রেক্ষিতেই আয়েষা জালাল (১৯৮৫) একটি সর্বময় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে তাঁর সংশোধনবাদী সমালোচনা শুরু করেছেন: "যা অধিকাংশ মুসলমানদের স্বার্থ এত কম পূরণ করেছে সেই পাকিস্তানের সৃষ্টি কীভাবে হল" ? (পৃঃ ৪)। জালালের মতে লাহোর প্রস্তাবে না 'বিভাজন' না 'পাকিস্তান' কিছুরই উল্লেখ ছিল না, এই প্রস্তাব ছিল জিন্নার "কৌশলী চাল"—ব্রিটিশ ও কংগ্রেস যাতে পৃথক মুসলিম জাতীয়ত্বের দাবি মেনে নেয় তাই এটি ছিল "তাঁর দরকষাকষির ক্ষেত্র" (পৃঃ ৫৭–৫৮)। জিন্না ভারতের জন্য যে ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা চেয়েছিলেন, তা ছিল দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রদেশগুলির থাকবে প্রখর স্বাতন্ত্র্য এবং কেন্দ্রে থাকবে হিন্দু-মুসলিম সমতা। জিন্না আশাবাদী ছিলেন যে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী কেন্দ্রের তীব্র পক্ষপাতী হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবি মেনে নেবে, তাঁর অধিকতর

Scanned by CamScanner

আগ্রাসী বিভাজনী পরিকল্পনার দাবি এড়ানোর জন্য, যে-বিভাজন "তিনি বস্তুতপক্ষে চাননি" (পৃঃ ৫৭)। কিন্তু কংগ্রেস বা ব্রিটিশ যে কোন পরিস্থিতিতেই পার্টিশান কখনোই মেনে নেবে না, সেটি ছিল একটি ভুল ধারণা। পরিশেষে কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নিয়েছিল এবং এইভাবে জিন্না তাঁর নিজেরই বুদ্ধির খেলায় হেরে যান। অসীম রায় জালালকে সমর্থন করে এক প্রবন্ধে আবেগের বশে বলেছেন যে "দিনের শেষে লীগ নয়, কংগ্রেসই ভারত মাতার দেহে ছুরি চালিয়েছিল"।[১৭৮] তবে এই জাতীয় ব্যাখ্যামূলক ছাঁচ উচ্চস্তরীয় রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়, নিম্নস্তরের রাজনীতিকে ততটা নয়। এই ব্যাখ্যামূলক ছাঁচ জিন্নাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়, তাঁর ভবিষৎ-কল্পনাভিত্তিক মনের গভীরে তলিয়ে দেখতে চায়। এমন কী যদি আমরা মেনেও নিই যে প্রথমে "দর কষাকষির ক্ষেত্র" হিসেবেই জিন্না পাকিস্তান ধারণার প্রচার করেছিলেন—এমনকী সুমিত সরকারও তা স্বীকার করেন [১৭৯] —তবুও ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যখন মুসলিম জাতীয়ত্বের এই ভাবগত প্রতীককে ঘিরে গণ-অভিযান শুরু হয় তখন জিন্নার দর কষাকষির স্বাতন্ত্র্য কতটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই অসামঞ্জস্যকে জালাল তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে সংশোধন করেছেন, যে-গ্রন্থে আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে—*Self and Sovereignty* (২০০০)। এই গ্রন্থে তিনি খুঁজেছেন কীভাবে উনিশ শতকের শেষ থেকে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের "ধর্মীয়ভাবে অবহিত সাংস্কৃতিক সত্তা" গড়ে ওঠে এবং কীভাবেই বা সেই ধারণা বিস্তৃত হয়ে জাতীয়ত্বের দাবিতে পরিণত হয়। জালাল স্বীকার করেন মুসলিম জাতীয়ত্বের এই তেজস্বী দাবি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের শেষ অবধি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রত্বের দাবি হয়ে ওঠেনি। তবুও জনসাধারণের মানসিকতা নিয়ে জালালের আলোচনা খবরের কাগজ পাঠ করা ও কবিতার সমঝদার জনগণের বাইরে যায়নি ; লাহোরে রাস্তাঘাটে অশিক্ষিত মুসলমান অথবা বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগে অবধি জালালের আলোচনা থেকে বৃহদাংশে বাদ থেকে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি পাকিস্তান আন্দোলন অনেক আগে থেকেই ব্যাপকতর জনগণকে নিয়েই ঘটেছিল, যেহেতু এর "অর্থ ছিল সব জিনিস সকলের" ; [১৮০] দাঙ্গা বেঁধে গেলে আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁচেছিল যে সেখান থেকে ফিরে আসার আর পথ ছিল না।

যাহোক একইভাবে একথা মনে করাও ভুল হবে যে জিন্না নেতৃত্ব দেননি ; বরং তিনি মুসলিম ঐকমত্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, কারণ মুশিরুল হাসান দেখিয়েছেন যে কোন মুসলিম ঐকমত্য ছিল না। হাসানের মতে "দ্বিজাতি তত্ত্ব"টি স্বয়ং মুসলিম ঐকমত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় "ভুল বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত ছিল"।[১৮১] রাজনৈতিক স্তরে কংগ্রেসের মতই লীগও "উপদলীয় কোঁদলে ও ভাবগত দিক থেকে খণ্ডিত" ছিল ; এবং জনসাধারণের স্তরে, এমনকি সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও

Scanned by CamScanner

চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিনেও বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তান ধারণার সঙ্গে মানসিক দিক থেকে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি, এমনকী ধর্মীয় বিভাজনকেও তারা অনতিক্রম্য সমস্যা হিসেবে মনে করেনি। অনেকেই যারা পার্টিশান অভিযানে যোগ দিয়েছিল তারা কার্যত উপর থেকে চাপানো উচ্চস্তরীয় সুসংবদ্ধ অভিযানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই অভিযানে সামিল হয়েছিল।[১৮২] হাসান তার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলছেন "ঔপনিবেশিক সরকারই নিজের প্রতিমূর্তির মত করে (মুসলিম) সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের যুদ্ধকালীন মিত্র লীগকে একটি খণ্ডিত জনসংখ্যাকে 'জাতি', একটি 'আইনসম্মত অস্তিত্বশীল সত্তায়' পরিণত করতে অনুমতি দিয়েছিল"।[১৮৩] সে যাহোক এসবের অর্থ এই নয় যে ব্রিটিশ রাজের রাজত্বকালের শেষ পর্বে পাকিস্তান আন্দোলনের পিছনে কোন জনসমর্থন ছিল না।

দেশ বিভাজনের ইতিহাসে জনসাধারণের ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি কিছু গবেষণা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইয়ান ট্যাবলট দেখিয়েছেন পাঞ্জাবে লীগ কীভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকে "বৈঠকখানা থেকে রাস্তায় টেনে আনে", কীভাবে শত শত, হাজার হাজার মুসলমানেরা নানাবিধ বিশেষ 'দিবস' পালন করত, বিক্ষোভে, মিছিলে ও ধর্মঘটে অংশ নিত, এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যুদ্ধ করত, এবং এইভাবে "মুসলিম লীগের দাবিগুলিকে বৈধ করে তুলত..."।[১৮৪] বাংলার ক্ষেত্রেও শীলা সেনের আগেকার গবেষণা এবং আরও সাম্প্রতিকালের তাজ হাশমির গবেষণায় দেখান হয়েছে "পাকিস্তান আন্দোলন জনসমর্থনপুষ্ট ও গণতান্ত্রিক ছিল", যেহেতু প্রতিশ্রুত ভূমির কল্পিত চিত্র তুলে ধরে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান কৃষকদের সাফল্যের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করা গিয়েছিল।[১৮৫] ১৯৪০-এর দশকে বাংলায় মুসলমান দাঙ্গাকারীরা স্পষ্টতই রাজনৈতিক স্লোগান "পাকিস্তান কি জয়" দিয়ে তাদের হিন্দু শত্রুদের আক্রমণ করেছিল এবং এর থেকে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখা বরাবর জনসাধারণের প্রভূত রাজনীতিকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৮৬] অনুরূপে, হিন্দুদেরকেও সংগঠিত করা হয়; জেফ্রেলট মনে করেন, হিন্দি বলয়ে আর.এস.এস.-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে "নিঃসন্দেহে পার্টিশান পরিস্থিতির" যোগ ছিল।[১৮৭] ইতিমধ্যেই একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন কীভাবে বাঙালি ভদ্রলোক পার্টিশনের পক্ষে আন্দোলন করেছিল এবং সেই আন্দোলনে অ-ভদ্রলোক শ্রেণীগুলিকেও যথারীতি সামিল করতে চেয়েছিল। এবং এই সব অ-ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেকগুলিই, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কিছু দলিত গোষ্ঠী পার্টিশান আন্দোলনের আহ্বানে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছিল, কারণ ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতবর্ষের উদীয়মান ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে তারা নিজেদের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিতে আগ্রহী ছিল।[১৮৮] এইসব গবেষণা থেকে এই কথাই প্রতিভাত হয় যে পাকিস্তান আন্দোলন আর কোনমতেই উচ্চকোটির বিষয় হয়ে থাকেনি।

Scanned by CamScanner

বামপন্থী ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রদায়িকতা ও পার্টিশানের প্রশ্নটি নানাভাবে উঠেছে। বিপিন চন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা মনে করেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার তরঙ্গাভিঘাতের" এবং প্রধানত "জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলমান জনগণকে সামিল করতে কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন ব্যর্থতার" কারণেই দেশ বিভাজন ঘটে। কংগ্রেসের নেতারা তাদের "ব্যর্থতা" স্বীকার করেছিলেন এবং "সেই পরিস্থিতিতে অনিবার্য ঘটনা হিসেবেই" পার্টিশানকে মেনে নিয়েছিলেন।[১৮৯] সুমিত সরকার মনে করেন "এই সাম্প্রদায়িকতা" ভারতীয়দের জনজীবনে তখনো সর্বব্যাপী হয়নি। বস্তুত আলোচনার টেবিলের চাইতে আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল—যেমনটি গণআন্দোলনে, কৃষক সংগ্রামে এবং ১৯৪০-এর দশকে শিল্প ধর্মঘটে বোঝা গিয়েছিল।[১৯০] কংগ্রেস নেতৃত্ব এইসব গণক্ষোভসমূহকে কাজে না লাগিয়ে এবং আরেক দফা গণআন্দোলনের ঝুঁকি না নিয়ে অনিবার্য মূল্যস্বরূপ দেশভাগকে তড়িঘড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের লোভনীয় বিকল্প হিসেবে মেনে নেয়। সুমিত সরকারের কাছে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল সেটি এই গণরাজনীতির অঙ্গ নয়। অপরপক্ষে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা যেমন জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে মনে করেন যে পার্টিশানের প্রথাগত উচ্চকোটির ইতিহাসচর্চায় "পার্টিশানের 'কারণ' প্রতিষ্ঠার" লক্ষ্যে খুব বেশি রকম সীমাবদ্ধ।[১৯১] পার্থ চ্যাটার্জী পার্টিশানকে গুরুত্ব দেন না কারণ তাঁর ধারণা এ সবটাই "সর্বভারতীয় খেলোয়াড়দের" নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং বাংলার পক্ষে অন্তত একথা বলা ইতিহাসসম্মতভাবে সঠিক হবে না যে পর্টিশান আন্দোলনে লক্ষণীয়ভাবে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল।[১৯২] পাণ্ডে তাই তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে "কারণ" থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে নিক্ষেপ করছেন ভুক্তভোগীদের কাছে পার্টিশানের অর্থের দিকে, ও এর দ্বারা উদ্ভূত মানসিক যন্ত্রণা ও পরিবর্তনের দিকে"।[১৯৩] তাঁর ধারণা "পার্টিশানের 'সত্য'" হিংসাশ্রয়ী ঘটনার মধ্যে নিহিত ছিল এবং তাই তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন পার্টিশানের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যারা বেঁচে রইল, হয় এর বলি, না হয় আগ্রাসক অথবা দর্শক হিসেবে, তারা এই হিংসাত্মক ঘটনাকে কীভাবে স্মরণে রেখেছে, অথবা এর সম্বন্ধে তাদের ধারণাই বা কী।[১৯৪]

নতুন এই আলোচনার ক্ষেত্রে পাণ্ডে অবশ্যই নিঃসঙ্গ নন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পার্টিশান বিষয়ক ইতিহাস চর্চার বিষয়সূচীর মধ্যে সাম্প্রতিককালে লক্ষণীয়ভাবে ক্ষেত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে পার্টিশানের কারণ নিয়ে ব্যস্ততার চাইতে অভিজ্ঞতার বিষয়ে জানার আগ্রহ অনেক বেশি। পার্টিশানের স্মৃতিকে আধার করে, এই জাতীয় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এবং "মহাকাব্যিক বিয়োগান্ত" পরিণতির চাক্ষুস বর্ণনাকে নিয়ে সম্প্রতি যেসব লেখাপত্র, প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের মধ্যেই এই আগ্রহ প্রমাণিত হয়।[১৯৫] দেশভাগের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের খুব একটা মাথা ব্যাথা নেই এখন, বরং দক্ষিণ এশিয়ায়

Scanned by CamScanner

দেশভাগের মত ঘটনার "পরবর্তী অবস্থা" বা "পরিণামের" অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নির্ণয়ে তাঁরা বেশি উৎসাহী।[১৯৬] অন্যভাবে বলা যায়, পার্টিশানের মত ঘটনা কীভাবে ঔপনিবেশিকোত্তর ইতিহাস ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল, কীভাবে পার্টিশানের স্মৃতি সাম্প্রদায়িক সত্তাকে ব্যাখ্যা করে থাকে, কীভাবে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে থাকে, তথা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ওপরে কীভাবে গুরুত্ব আরোপ করে, ঐতিহাসিকেরা সেইসব দিকেই নজর দেন। তাঁরা নিজেরা সচেতনভাবেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দকে এবং দুটি জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকে "সমস্ত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি" বলে গণ্য করতে অস্বীকার করেন।[১৯৭]

Scanned by CamScanner